পশ্চাৎপদতার এ অচলায়তন ভাঙ্গতে অপরিহার্য যুগপৎ সাংস্কৃতিক আন্দোলন ।

মোঃ জানে আলম*

স্বাধীনতার দীর্ঘ সাড়ে তিন দশক পর আজ আমরা অপার বিস্ময় ও বুকভরা বেদনা নিয়ে উপলব্ধি করছি যে, পশ্চাৎপদতার এক অচলায়তনে বন্দী হোয়ে আছে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি––বাংলাদেশ। যে ন্যূনতম আকাঙ্খা ও স্বপ্ন নিয়ে ইতিহাসের এক নজিরবিহীন ত্যাগের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছিলাম, সে স্বপ্ন ভঙ্গের বেদনায় আজ সমগ্র জাতি মুষড়ে পড়েছে। অথচ দীর্ঘ স্বাধীকার থেকে স্বাধীনতা আন্দোলন––চূড়ান্ত পরিণতিতে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা যে চেতনা ও মূল্যবোধ অর্জন করেছিলাম, একটি সদ্যস্বাধীন জাতির এগিয়ে যাওয়ার জন্য তা ছিল অত্যন্ত যুগোপযোগী। মধ্যযুগীয় ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের খোলস ভেঙ্গে নৃতাত্ত্বিক বাঙালি জাতীয়তাবাদ, সামরিক স্বৈরতন্ত্রের বিপরীতে গণতন্ত্র, শোষণহীন সমাজ বিনির্মাণ ও একটি অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ, এসবই ছিল একটি ধারাবাহিক আন্দোলন-সংগ্রাম ও সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের অর্জন। সঙ্গত কারণেই স্বাধীনতার অব্যবহিত পর আমাদের রাষ্ট্রীয় সংবিধানেও এসকল আদর্শ মূল রাষ্ট্রীয় নীতিমালা হিসাবে গৃহীত হয়। তারপরও কেন সে আধুনিক চেতনা ও মূল্যবোধের পথ ধরে আমরা এগুতে পারলাম না? কেন আমাদের এ ভাগ্য বিপর্যয়? কেন পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশের কলঙ্ক তিলক আমাদের মাতৃভূমির ভালে শোভা পাচ্ছে? এ প্রশ্নগুলোর জবাবের মধ্যেই নিহীত আছে সর্বগ্রাসী এ পশ্চাৎপদতা থেকে দেশ ও জাতিকে উদ্ধার করার পথের দিশা––পশ্চাৎপদতার অচলায়তন ভাঙ্গার দিগ্‌নির্দেশনা।

আমাদের সংকট কোথায়?

আমাদের মূল সংকট আমাদের আর্থ-সামাজিক পশ্চাৎপদতা––মুক্তবাজার অর্থনীতিকে উন্নয়নের অব্যর্থ মডেল হিসাবে গ্রহণ করা হলেও স্বাধীনতার সাড়ে তিন দশক পরও বস্তুতঃ দেশে কাঙ্খিত শিল্পায়ন ঘটেনি। কৃষিতে এখনো বিদ্যমান সামন্তবাদী ও আধাসামন্তবাদী উৎপাদন সম্পর্ক। ফলতঃ সমাজে যেমন শ্রেণী বৈষম্য তীব্র হোয়েছে, তেমনি বৃদ্ধি পেয়েছে গ্রাম ও শহরের মধ্যে বৈষম্য। উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কহীন এক শ্রেণীর শহুরে লুঠেরা ধনিকদের সীমাহীন জৌলুস–আধুনিক জীবন যাপন–আর অন্যদিকে গ্রামের বিশাল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার প্রাণান্তকর আদি সংগ্রাম–এ স্ববিরোধী বৈশিষ্ট্যই আজ আমাদের সমাজের বাস্তবতা।

আমাদের সংকট সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা–– অশিক্ষা-কুশিক্ষা, ধর্মান্ধ চিন্তা-চেতনা, কুসংস্কার ও সাম্প্রদায়িকতা, আমাদের ঐতিহ্য-ইতিহাস নিয়ে বিতর্ক, আমাদের আত্মপরিচয় নিয়ে বিভ্রান্তি।

স্মর্তব্য যে, আর্থ-সামাজিক সংকট ও সামাজিক সাংস্কৃতিক সংকট পরস্পর নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা মৌলিক বিষয় (Basis of the society) হলেও সে সংকট সমাধানে সামাজিক-সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসাবে কাজ করে। এক্ষেত্রে বিভ্রান্তি এড়াতে আমাদের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর ভিত্তি (Infra-structure) ও উপরিকাঠামোর (Super-structure) দ্বান্দ্বিক সম্পর্কটা মনে রাখতে হবে। কারণ অনেকে গুলিয়ে ফেলেন যে, একটি আর্থ-সামাজিক কাঠামোর ভিত্তি বা অবকাঠামোর উপর যেমন ঐ সমাজের উপরিকাঠামো গড়ে ওঠে, আবার উপরি কাঠামোরও আছে আপেক্ষিক স্বাধীনতা––যা অবকাঠামোকে প্রভাবিত করে--পরিবর্তন করে। সহজভাবে বললে, আমাদের আর্থ-সামাজিক পশ্চাৎপদতা আমাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতার মূল কারণ বটে, তবে আমাদের এ সামাজিক-সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা আমাদের আর্থ-সামাজিক পশ্চাৎপদতা উত্তরণের পথে প্রধান অন্তরায়ও বটে। এভাবে আর্থ-সামাজিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতার এক দুষ্টচক্রে (vicious circle) আটকে গেছে দেশ ও জাতির উন্নয়ন অগ্রগতি। তাই কেবল রাজনৈতিক আন্দোলন––অবাধ-নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন––আরো সুনির্দিষ্টভাবে বললে, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির ক্ষমতারোহণের মাধ্যমে এ সংকট থেকে উত্তরণ সম্ভব হবেনা। এ বক্তব্যের যথার্থতা উপলব্ধি করতে হলে আমাদের বর্তমান সংকটের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে হবে।

আর্থ-সামাজিক পশ্চাৎপদতার স্বরূপ

আমাদের স্বাধীনতার মূল স্বপ্ন ছিল একটি শোষণহীন সমাজ। তাই স্বাধীনতার পর সদ্যস্বাধীন দেশের উৎপাদন খাত––ছোট-বড়-মাঝারি প্রায় সকল শিল্পকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংক-বীমা জাতীয়করণ করা হয়েছিল। ভূমি মালিকানার সিলিং নির্ধারণ করা হয়েছিল ১০০বিঘা। লক্ষ্য ছিল অধনবাদী বিকাশের পথে (By passing capitalism) সমাজতন্ত্র বিনির্মাণ করা । কিন্ত ১৯৭৫ ইং সালের সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে যে প্রতিবিপ্লবী শক্তি ক্ষমতা দখল করে, তারা উন্নয়নের গতিমুখ পাল্টে দেয়। তথাকথিত অবাধ অর্থনীতি বা মুক্তবাজার অর্থনীতির শ্লোগানে শুরু হলো রাষ্ট্রায়াত্ত্ব

শিল্পকারখানা, ব্যাংক-বীমা ও ব্যবসা বাণিজ্যের বিরাষ্ট্রীয়করণ। বলাবাহুল্য এ প্রক্রিয়া বিগত আওয়ামী লীগ শাসন আমল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

এ মুক্তনীতি ও ঢালাও বিরাষ্ট্রীয়করণের নীট ফলাফল দাঁড়াল নিম্নরূপঃ

ক) রাষ্ট্রায়াত্ত্বখাতের পাঁচ শতাধিক শিল্পকারখানা অযৌক্তিক সুলভমূল্যে ব্যক্তি মালিকেরা ফেরত ফেল।

খ) বৈদেশিক বাণিজ্য পুরোটাই হস্তান্তরিত হলো ব্যক্তি খাতে।

গ) যে সমস্ত শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠান জাতীয় অর্থনীতিতে স্পর্শকাতর ভূমিকা রাখার জন্য এমনকি অগ্রসর পুজিঁবাদী দেশেও বক্তিমালিকানায় রাখা নিরাপদ মনে করা হয়না, যেমন বিদ্যুৎ, জ্বালানী তেল, গ্যাাস, রেল, বন্দর ইত্যাদি সেক্টরকেও ব্যক্তিমালিকানায় তুলে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হলো।

ঘ) সার ও কীটনাশক ঔষধসহ কৃষি উপকরণ থেকে ভর্তুকী প্রত্যাহার , কৃষিঋণ বিতরণে দুর্নীতি ও অনিয়ম এবং সামগ্রিকভাবে সরকারের ধনিক ও শহর অভিমুখী উন্নয়ন প্রয়াসের ফলে গ্রামীণ দারিদ্র্য পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করল। সার্বিক পরিণতিতে ব্যক্তি খাতে হস্তান্তরিত পাঁচ শতাধিক শিল্পকারখানার ৬০% বর্তমানে অস্তিত্বহীন এবং বাকী ৪০% রুগ্‌ণ হয়ে আছে। বিয়াল্লিশ হাজার কোটি টাকার ব্যাংক ঋণ আত্মসাৎ করেও ব্যক্তিমালিকেরা শিল্পকারখানা গড়ে তুলেনি। বরং উক্ত ঋণের টাকার একটি সিংহভাগ পাচার হয়ে গেছে বিদেশে। বেকারের সংখ্যা তিন কোটির উপরে। ফি বছর ২১/২২ লক্ষ শিক্ষিত বেকার শ্রমের বাজারে প্রবেশ করছে। দুর্নীতি সর্বগ্রাসী রূপ পরিগ্রহ করে পুরো সমাজকে গিলে ফেলেছে। বিশ্বের সর্বাপেক্ষা দুর্নীতিগ্রস্থ দেশের কলঙ্ক তিলক আমাদের মাতৃভূমির ভালে শোভা পাচ্ছে বিগত পাঁচ বছর ধরে। ভৌগোলিক স্বাধীনতার মাধ্যমে বিজাতীয় শোষণ থেকে মুক্তি পেলেও নয়া-ঔপনিবেশিক শোষণের শৃঙ্খলে বাঁধা আজ আমাদের অর্থনীতি। উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কহীন ঋণখেলাপি–কালটাকার মালিক––সমাজদ্রোহী সন্ত্রাসী–– দুর্নীতিবাজ সামরিক-বেসামরিক আমলার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একটি মাফিয়া চক্র আজ নিয়ন্ত্রণ করছে দেশের রাজনীতি। অর্থনীতির চাবিকাঠিও তাদের হাতে। বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে আজ রাজনীতি হোয়ে দাঁড়িয়েছে যে কোনভাবে ক্ষমতায় যাওয়া কিংবা ক্ষমতায় থাকার কৌশল। সৎ-দেশপ্রেমিক-মেধাবী মানুষেরা আজ রাজনীতি থেকে নির্বাসিত। সংসদে নির্বাচিত সাংসদদের অধিকাংশ বেনিয়া-ঋণ খেলাপী। রাজনীতি তাদের কাছে সর্বাপেক্ষা লাভজনক ব্যবসা। অপশাসন–দুঃশাসনে জনগণের নাভিশ্বাস ওঠেছে। শ্রেণী বৈষম্য আজ চরম আকার ধারণ করেছে। স্বাধীনতার দীর্ঘ সাড়ে তিন দশক পরেও আমাদের দেশে যেমন একটি সত্যিকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিকশিত হয়নি, তেমনি দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানেও ধারাবাহিকভাবে শাসনকারী দলগুলোর চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলাচনা থেকে আমরা কি এ অনুসিদ্ধান্তে পৌছতে পারিনা––মুক্তবাজার অর্থনীতির যে লাগামহীন ঘোড়ায় জাতিকে সওয়ার করানো হয়েছিল এগিয়ে যাওয়ার সোনালী স্বপ্ন দেখিয়ে, বিশ্বায়নের চোরাবালিতে সে ঘোড়া বহু পূর্বেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে ।

ফলাফল দাঁড়াল––এদেশে না ঘটল পুঁজিবাদের বিকাশ, নাহলো কোন শোষণহীন সমাজ বির্নিমাণ। বরং পৃথিবীর একটি দরিদ্রতম দেশের অভিধা আজ আমাদের দেশের ভাগ্যে জুটেছে। সুনির্দিষ্ট কোন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক দর্শনের অভাবে অবাধ লুঠপাট-দুর্নীতি আজ আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। যে কোন ভাবে ক্ষমতায় যাওয়া ও ক্ষমতায় থাকা আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি। পেশী শক্তি ও কালটাকার জোরে নেতৃত্ব ঠিকিয়ে রাখা আজ আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি। জনগণের কল্যাণে রাজনীতি--জনগণের জন্য রাজনীতির বিপরীতে স্বজনপ্রীতি-দলপ্রীতি-গোষ্ঠীপ্রীতি আজ আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতার বিপরীতে পরিবারতন্ত্র-গোষ্ঠীতন্ত্র আজ আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি। মূল নেতানেত্রীদের তোষামোদি, মোসাহেবী আজ আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি। রাজনীতিবিদরা সমাজের মেধাবী, ত্যাগী ও প্রাগ্রসর প্রজন্ম––এসব আজ কল্প কথায় পরিণত হোয়ে গেছে। জনগণের জন্য ত্যাগ––দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রাম––এসবের বিপরীতে পেশীশক্তি, কালটাকা ইত্যাদি হয়ে গেছে রাজনীতিতে টিকে থাকার, সাংসদ মন্ত্রী হওয়ার অব্যর্থ মহৌষধ। রাজনৈতিক সংস্কৃতির পঁচা ডোবায় জন্ম নিয়েছে মধ্যযুগীয় পশ্চাদপদ ধ্যান-ধারণার অসংখ্য শৈবাল––ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা, নিয়তিবাদ, মৌলবাদ, জঙ্গীবাদ। হীন রাজনৈতিক স্বার্থে–– ভোটের রাজনীতির কারণে--আমাদের রাজনীতিবিদরা––বিশেষভাবে বৃহৎ রাজনৈতিক দলের নেতারা--যারা ক্ষমতায় আছেন, ক্ষমতায় ছিলেন এবং ক্ষমতায় যাবেন–– সে পশ্চাদপদ ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধের শিকড়ে জল সিঞ্চন করে চলেছেন প্রতিনিয়ত। ব্যক্তিজীবনে তাদের সততা প্রশ্নবোধক হলেও এবং পারিবারিক জীবনে অত্যন্ত আধুনিক ও বিলাসবহুল জীবন যাপন করলেও রাজনৈতিক অঙ্গনে তারা এক এক জন পুরাদস্তর মোল্লা-পুরোহিত সেজে বসে আছেন। ধর্মের আলখাল্লা পরা, হাতে তসবিহ, মাথায় টুপি, টিকি, দাঁড়ি রাখা, ফি বছর হজ্জ করা, সভা-সমাবেশে ধর্মীয় মূল্যবোধের

কথা বলা, তাদের অনেকেরই স্বভাব ধর্ম হোয়ে গেছে। একটি সমাজের শাসকশ্রেণীর মূল্যবোধই সমাজে প্রধান মূল্যবোধ হিসাবে বিরাজ করে। (The ruling ideas of a society are the ideas of the ruling class.)। তার সর্বগ্রাসী প্রভাব পড়ে সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উপর। পরিণামে মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণার লতাগুল্ম-আগাছা জন্ম ও বিকাশের জন্য আমাদের সমাজের মানসভূমি অত্যন্ত উর্বর হয়ে আছে। সে সুযোগে সমাজের তৃণমূলের আমজনগণকে নিয়তিবাদ ও মৌলবাদে দীক্ষাদান সহজ হোয়ে গেছে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষে। ফলশ্রুতিতে মৌলবাদের বিকাশ ও জঙ্গীবাদের উত্থান।

আমাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতার স্বরূপঃ

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, আমাদের আর্থ-সামাজিক পশ্চাদৎপদতা যেমন আমাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক পশ্চাদৎপদতার মূল কারণ, তেমনি আবার আমাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা আমাদের আর্থ-সামাজিক পশ্চাৎপদতা দূরীকরণে প্রধান অন্তরায়। তাই আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের যে আন্দোলন, সে আন্দোলনকে সফল করতে হলে সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থার পরিবর্তন আনতে হবে। রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে যুগপৎ গড়ে তুলতে হবে সাংস্কৃতিক আন্দোলন। তাই প্রথমতঃ আমাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পশ্চাদৎপদতার স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে হবে। একটি জাতির সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থা হলো তার মূল্যবোধ, চিন্তা, চেতনা, যুক্তিবোধ, বিশ্বাস ইত্যাদি, যা আবার মূলতঃ নির্ভর করে জনগোষ্ঠীর শিক্ষার মানের উপর। একটি সমাজের প্রগতি নির্ভর করে জ্ঞানের প্রগতির উপর, অর্থাৎ সংস্কৃতির প্রগতির উপর। স্বাধীনতার দীর্ঘ সাড়ে তিন দশক পরও আমাদের শিক্ষার হার এখনো ত্রিশ শতাংশ অতিক্রম করেনি––তাও আবার অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন মানুষসহ। শিক্ষার গুণগতমান নিয়ে প্রশ্নতো আছেই। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে দীর্ঘদিন যাবত নানা পরীক্ষা-নীরিক্ষা চললেও তার সবকিছুই সীমাবদ্ধ থাকছে কেবল শিক্ষার পদ্ধতি নিয়ে। শিক্ষার বিষয়বস্তু ও লক্ষ্য তেমন গুরুত্ব পাচ্ছেনা। তাই শিশুশিক্ষা থেকে সর্বোচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত আমাদের শিক্ষা কারিকুলামের একটি বৃহৎ অংশ জুড়েই আছে ধর্মীয় শিক্ষা। শিক্ষার বিষয়কে––বিশেষভাবে বিজ্ঞান শিক্ষাকে কেবল একটি টেক্‌নিক্যাল বিষয় হিসাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে শিক্ষা নিজেকে আলোকিত করা নয়, নিছক জীবিকা অর্জন––ক্যারিয়ার গড়ে তোলার উপায় মাত্র। শিক্ষার সাথে শিক্ষার দর্শনের সংশ্রব নেই। তাই আমরা অবাক-বিস্ময়ে দেখি, আমাদের প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজগুলো থেকে প্রতি বছর ডাক্তার-ইঞ্জিনীয়ারদের সাথে দলে দলে হুজুরও বের হয়ে আসছে । তারা তাদের পরবর্তী কর্ম জীবনের বেশকিছু মূল্যবান সময় ব্যয় করে সাধারণ মানুষকে আল্লাহ ও ধর্মের পথে আহবান জানিয়ে। দেশ ও জাতির প্রতি যে ইহজাগতিক দায়িত্ববোধ, তা তাদের কাছে গৌণ। তারা কেবল পরকালের স্বর্গ অন্বেষণে উদগ্রীব। তারা তাদের পরলৌকিক মুক্তির জন্য যত উৎকণ্ঠিত, সমাজের ইহজাগতিক সমস্যা নিয়ে ততোধিক নিস্পৃহ। অর্থাৎ আমাদের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার গলদটা এত মারাত্মক যে, বিজ্ঞান শিক্ষাও আমাদের ছেলে-মেয়েদের বিজ্ঞানমনস্ক করতে ব্যর্থ হচ্ছে। কারণ সত্যিকার বিজ্ঞানভিত্তিক কোন শিক্ষা কারিকুলাম আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে অনুসরণ করা হয়না। মূলধারার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার যেখানে এ অবস্থা, সেখানে সমাজের তৃণমূলে, রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষকতায় "কওমী মাদ্রাসা" শিক্ষা নামে বেসরকারী এক অদ্ভুত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত, যেখানে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শেখানোতো দূরের কথা, উল্টোভাবে আধুনিক শিক্ষার বিরুদ্ধে, সকল প্রকার আধুনিকতার বিরুদ্ধে কোমলমতি ছেলেদের মগজ ধোলাই করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। জীবনমুখী শিক্ষার পরিবর্তে সে সমস্ত মাদ্রাসায় অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়––শৌচাগারে ঢুকতে ও বের হতে কী দোয়া পড়তে হবে, কোন দিকে মুখ করে প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতে হবে, রুটির কোন পিট আগে খাবে, কীভাবে আক্‌দ হবে, কী কী কারণে বিবি তালাক দেওয়া যাবে, বিবির সাথে সহবাসের নিয়ম কী এবং তৎপর তৈয়ম্মুম কীভাবে করতে হবে, নারীদের পর্দাপুশিদা কী ভাবে নিশ্চিদ্র করে তাদের অন্তপুরবাসিনী করা যাবে––আধুনিক জীবনের প্রেক্ষিতে তুচ্ছাতিতুচ্ছ এবং একান্ত ব্যক্তিগত––ইত্যাকার বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে––যার ভিত্তি হচ্ছে মধ্যযুগীয় মূল্যবোধ, পরলৌকিক চিন্তা ও নিয়তিবাদ। সর্বাপেক্ষা মারাত্মক যে ক্ষতিটা তারা করছে, তাহলো গ্রামের গরীব মানুষের কোমলমতি সন্তানদের এমনভাবে মগজ ধোলাই করা হচ্ছে, যার ফলে সব ঘটনার জন্য কোন কার্য-কারণ ব্যতিরেকে তারা নিয়তি এবং একমাত্র নিয়তিকেই দায়ী করছে, এর বাইরে কোন কিছুই তারা ভাবতে পারেনা। কার্য-কারণ মানা ছাড়া কোন মানুষ যুক্তিবাদী হতে পারেনা। তাই আজ আমাদের সমাজের যে সকল দুর্দশা, এমকি প্রাকৃতিক দুর্যোগকে পর্যন্ত তারা আল্লাহের গজব বলে মনে করে। অতএব, তাদের মতে কোন দুর্যোগ কিংবা কোন সংকটের প্রতিকার কিংবা প্রতিরোধ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, যতক্ষণ না সৃষ্টিকর্তা চাইবেন। তাই সকল প্রকার বালা-মুসিবত কিংবা সংকট সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য কেবল কায়মানোবাক্যে প্রার্থণা করা ছাড়া তাদের কাছে কোন বিকল্প থাকেনা। এ মাদ্রাসায় শিক্ষিত লোকেরা কিছু দিন পূর্বে ঘটে যাওয়া সুনামীর মত মহাদুর্যোগকেও আল্লাহের গজব বলে

প্রকাশ্যে ফতোয়া দিয়েছে। মজার ব্যাপার হলো––তাদের কেহ কেহ সুনামীর ফলে সৃষ্ট সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গচূড়ায় 'আল্লাহু' শব্দও নাকি দেখতে পেয়েছেন এবং বিভিন্ন ইসলামী ওয়েব-সাইটে তা প্রচারও করেছেন। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, সর্বোপরি সীমাহীন দারিদ্রের কারণে গ্রামের মানুষ এখনো তাবিজ-মাদুলী পানিপড়া খেয়ে রোগ মুক্তির স্বপ্ন দেখে। নিজেদের সকল দুর্ভোগের জন্য নিজেদের নসীব বা নিয়তিকে দায়ী বলেই মেনে নিচ্ছে। যার ফলে ভাগ্য পরিবর্তনের কোন আন্দোলনে তারা শরীক হয়না। অথচ একমাত্র যুক্তিবাদী মানুষই নিজেদেরকে পরিচালিত করতে পারে যে কোন বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রামে। অতএব দেখা যাচ্ছে, আমাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পশ্চাদৎপদতা আমাদের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক পশ্চাদৎপদতা কাটিয়ে ওঠার পথে দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাতে করে রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তন হলেও পশ্চাদৎপদতার যে সংস্কৃতি আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে তা থেকে জাতিকে মুক্ত না করলে আমাদের সার্বিক মুক্তি সুদূর পরাহত। তাই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি আজ একটি রাজনৈতিক ঐক্যমোর্চা হলেও যুগপৎ সাংস্কৃতিক আন্দোলন না হলে রাজনৈতিক পরিবর্তন অর্থহীন হোয়ে পড়বে। রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি প্রয়োজন একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং অবিলম্বে তা শুরু করা উচিত।

কী হবে সে কাঙ্খিত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের রণকৌশল ও কর্মপদ্ধতিঃ

উপরের আলোচনা থেকে আমরা উপলব্ধি করেছি যে, আমাদের সকল পশ্চাৎপদতার মূলে রয়েছে যেমন আমাদের আর্থ-সামাজিক পশ্চাৎপদতা, তেমনি সামাজিক-সাংস্কৃতিক পশ্চাদৎপদতা। এ দুটিই পরস্পর নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। সামগ্রিকভাবে এ আমাদের সাংস্কৃতিক সংকট। আর্থ-সামাজিক বিষয়গুলো হলো সংস্কৃতির বস্তুগত দিক, যার সমাধান করতে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক আন্দোলনের বিকল্প নেই। কিন্তু সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংকট হলো আমাদের মনস্তাত্ত্বিক––আমাদের চিন্তা, চেতনা ও মূল্যবোধের সংকট। এ সংকট থেকে উত্তরণে আমাদের প্রয়োজন চিন্তার মুক্তি। চিন্তার মুক্তির অপরিহার্য পূর্বশর্ত হচ্ছে যুক্তিবাদ। কোন রাজনৈতিক আন্দোলন দিয়ে একটি দরিদ্র, অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনগোষ্ঠীকে যুক্তিবাদী করা যাবেনা––তার চিন্তার আড়ষ্টতা বা বন্দীত্ব ঘুচানো যাবেনা। তার জন্য আমাদের লড়াই বা আন্দোলনের ক্ষেত্র হবে আমাদের মানসভূমি এবং সেখানে লড়াই বা আন্দোলনের কৌশল ও হাতিয়ারও হবে ভিন্ন––মনস্তাত্ত্বিক। বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুক্তি, অপদর্শনের বিরুদ্ধে সঠিক দর্শন, কুসংস্কার, বুজরুকি ও নিয়তিবাদের বিরুদ্ধে কার্য-কারণ অনুসন্ধান হবে এ

মনস্তাত্ত্বিক লড়াই এর কৌশল ও হাতিয়ার। আমাদের বিদ্যমান সামাজিক-সাংস্কৃতিক-পরিবেশের বেনিফিশিয়ারী বর্তমান শাসকগোষ্ঠীতো বটেই, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে ঘাপটি মেরে থাকা বেনিয়ার দল, বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি যাদের সুযোগ করে দিচ্ছে বারংবার ক্ষমতায় যাওয়ার, শোষণ করার, আমজনগণকে ধোঁকা দিয়ে তাদের সম্পদ আত্মসাৎ করার, তারাও বিদ্যমান সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ অক্ষুণ্ন রাখার পক্ষে। অতএব এ সাংস্কৃতিক আন্দোলনটা শুরু হতে হবে সচেতন, প্রগতিশীল নাগরিকদের মধ্য হতে– যার আশু লক্ষ্য হতে পারে নিম্নরূপ––

চিন্তার মুক্তির মাধ্যমে বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ সৃষ্টি, সকল প্রকার কুসংস্কার--নিয়তিবাদ--অদৃষ্টবাদ- অলৌকিকতায় বিশ্বাস, ধর্মান্ধতা, মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি থেকে মুক্ত করে যুক্তিবাদের বিকাশ। সকল প্রকার চিন্তার মুক্তি ঘটাতে হলে বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। আমাদের সচেতন ও প্রগতিশীল নাগরিক সমাজ, প্রগতিশীল রাজনৈতিক সংগঠনগুলো বিভিন্ন বেসরকারী ক্লাব, সংগঠন, সমিতি, পাঠচক্র গড়ে তুলে আমজনগণকে বিজ্ঞানভিত্তিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার উদ্যোগ নিতে পারেন––বিভিন্ন অবৈজ্ঞানিক চিন্তা চেতনা ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক প্রচার প্রচারণা চালিয়ে। এ প্রচার-প্রচারণা চালানো যায় সঙ্গীতের মাধ্যমে––গ্রামে গ্রামে জনপ্রিয় লোক সঙ্গীত-কবিগান, পথনাটক-প্রহসন এর মাধ্যমে, আলোচনা-সেমিনার, মতবিনিময় , গ্রামের উঠতি তরুণ-তরুণীদের নিয়ে বিষয় ভিত্তিক পাঠচক্র আয়োজন করে। সে সকল পাঠচক্রে মানুষদের––বিশেষভাবে গ্রামের মানুষদের সচেতন করা যেতে পারে কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিকিৎসা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ––সাধু-সন্ত, ভিক্ষু-মোহন্ত, তান্ত্রিক-হুজুরদের তাবিজ-মাদুলী পানি পড়া-ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদি অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসার অসারতা তুলে ধরে। তাদের তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতার বুজরুকি ফাঁস করে দিয়ে। আলোচনা--মতবিনিময়––পাঠচক্রের মাধ্যমে আমাদের আর্থ-সামাজিক পশ্চাদপদতার মূল কারণ জনগণের সামনে তুলে ধরা, যাতে তারা বুঝতে পারে অদৃষ্ট বা নিয়তি নয়, বিদ্যমান শোষণমূলক সমাজব্যবস্থা ও শাসকগোষ্ঠীর নিরন্তর শোষণ ও ব্যর্থতাই আমাদের দারিদ্রের মূল কারণ। এ পশ্চাদপদতা থেকে কোন অলৌকিক ক্ষমতাবলে মুক্তি পাওয়া যাবেনা, মুক্তি পেতে হলে আমাদের বর্তমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম করতে হবে। আশার কথা হলো এ জাতীয় কিছু আন্দোলন ইতোমধ্যেই আমাদের সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে শুরু হয়েছে, সীমিত পরিসরে হলেও। যেমন সুশীল সমাজের "যোগ্য প্রার্থী আন্দোলন" যার মাধ্যমে তারা সংসদ নির্বাচনে সৎ, যোগ্য ও দেশপ্রেমিক লোকদের নির্বাচিত করার জন্য জনগণকে সচেতন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। টিআইবি দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবিরাম প্রচার চালিয়ে, দুর্নীতির পরিসংখ্যান বের করে

জনসচেতনতা বৃদ্ধি করছে। বিভিন্ন এনজিও বিভিন্ন সেমিনার-মতবিনিময়ের মাধ্যমে সুশাসনের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করছে। এগুলো অবশ্যই সাংস্কৃতিক আন্দোলন, তবে অত্যন্ত সীমিত পর্যায়ে। তাকে যেমন তৃণমূলে নিতে হবে, তেমনি তার পরিধিও বিস্তৃত করতে হবে। মানুষকে যুক্তিবাদী করার কোন কার্যকর আন্দোলন আমাদের দেশে এখনো গড়ে ওঠেনি। কিছু সাহসী মানুষ কয়েকটি ইন্টারনেট ভিত্তিক সাইবার ডিস্কাশন ফোরাম–যেমন "মুক্ত-মনা" (www.mukto-mona.com) গড়ে তোলার মাধ্যমে একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ নিলেও তার পরিধিও সঙ্গত কারণেই অত্যন্ত সীমিত––শুধু কিছু ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের মধ্যে–– দেশের মধ্যে তার অবস্থান অনেকটা অপরিচিতও বটে। এমতাবস্থায় এজাতীয় ফোরামকে সাংগঠনিক কাঠামোতে নিয়ে এসে তাদের কর্মতৎপরতা আমজনগণের মধ্যে বিস্তৃত করতে হবে, আলোচনা, মতবিনিময়, পাঠচক্র, পত্রিকা-লিফলেট-পুস্তিকা প্রকাশের মাধ্যমে। ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বিরুদ্ধেও মানুষকে সচেতন করতে হবে––তার অসারতা ও অযৌক্তিতা তুলে ধরে। সুশীল সমাজ তাদের "যোগ্যপ্রার্থী আন্দোলনে"ও এ বিষয়টি যোগ করতে পারেন। কারন ধর্মভিত্তিক রাজনীতি তথা মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা আজ আমাদের এগিয়ে যাওয়ার পথে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসাবে কাজ করছে এবং আজকের যে জঙ্গীবাদের উত্থান তাও ধর্মভিত্তিক রাজনীতির করুণ পরিণতি। আমাদের দেশে এখনো বিদ্যমান বিভিন্ন প্রগতিশীল সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো––উদীচি, ছায়ানট, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, বিভিন্ন গ্রুপ থিয়েটার তাদের নৃত্য-সঙ্গীত-ললিতকলার চর্চায়, অর্থাৎ তাদের পারফরমিং আর্টের মাধ্যমে মানুষের এ চেতনা বিকাশে ভূমিকা রাখতে পারে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের রাজনৈতিক দলগুলো এতদুদ্দেশ্যে একটি সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট গড়ে তুলতে পারে ।

এভাবে আমাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংকটের নিরসন ছাড়া কেবল ক্ষমতার পালাবদল বা রাজনৈতিক পালাবদল আমাদের পশ্চাৎপদতার এ অচলায়তন ভাঙ্গতে পারবেনা। জাতি কেবল উত্তপ্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত উনুনে নিক্ষিপ্ত হবে।

** মোহাম্মদ জানে আলম।*
গবেষণা, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান বিষয়ক সম্পাদক,
গণফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটি।